বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

ডা. জাকির নায়েক

বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

ডা. জাকির নায়েক

ISBN : 984-300-002078-1

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশক

এম.জি. কিবরিয়া

প্রোপ্রাইটর

র‍্যাকস পাবলিকেশন্স

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশনায়

দি রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স

২৪৬ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রাপ্তিস্থান

আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা

আযাদ বুকস্, চট্টগ্রাম

ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাজশাহী

কুরআন মহল, সিলেট

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০৮

তৃতীয় প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৪

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও ছাপা

র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ

কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)

ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২২১৯৫

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

Concept of God in major religions Authored by **Dr. Zakir Naik** Translated into Bengoli by Md. Monirul Islam Published by M.G. Kibria Proprietor RAQS Publications 230 New Elephant Road, Dhaka-1205 First Edition June 2008 Third Edition November 2014 Price Tk. 35.00 only ($ 1.00)

প্রকাশকের কথা

ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক যাঁকে বর্তমান বিশ্ব ডা. জাকির নায়েক নামেই চেনে। পেশাগতভাবে ডাক্তার হলেও তিনি বর্তমান বিশ্বে ইসলামের একজন বড়োমাপের দা'ঈ (প্রচারক) হিসেবে পরিচিত। তিনি ভারতের নাগরিক এবং ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মোম্বাই-এর প্রতিষ্ঠাতা। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডা. নায়েক তাঁর প্রতিষ্ঠিত টি ভি চ্যানেল Peace TV-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত চালিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি কুরআন, হাদীস, বাইবেল, গীতা, বেদ-পুরান, মহাভারতসহ বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ থেকে কম্পিউটারের মত তাৎক্ষণিক উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম। তিনি একজন সুবক্তা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হাজারো মানুষের সমাবেশে তিনি উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করেন এবং অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত জবাব পেশের মাধ্যমে অমুসলিমসহ পৃথিবীর মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করায় উদ্বুদ্ধ করেন।

ডা. জাকির নায়েক একজন প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত। তিনি ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম। তাঁর টিভি বক্তৃতা ও বিতর্কগুলো বাংলা ডাবিং করে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশের 'ইসলামিক টিভি'। তাঁর বক্তৃতার আওয়াজ কানে গেলেই লোকজন দাঁড়িয়ে যায় এবং ভাষণ শোনার জন্য ভীড় লেগে যায়। আগ্রহী এই মানুষের কাছে বাংলা ভাষায় পুস্তক আকারে ডা. জাকির নায়েকের বক্তৃতাগুলো সারা দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌছে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তাঁর রচিত Concept of God in Major Religions-এর বাংলা অনুবাদ 'বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা'।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের আগ্রহের কথা চিন্তা করে গ্রন্থখানি আমরা প্রকাশনায় হাত দেই। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ বইটি পড়ে উপকৃত হবেন এবং তাঁদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিতে বইটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই বইয়ের মাধ্যমে যদি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাঠক লাভ করতে পারেন, তাহলে আমদের শ্রম সার্থক হবে মনে করবো।

নির্ভুল বই প্রকাশনা একটি কঠিন কাজ। পাঠকের নিকট বইটিতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানাবেন। আশা করি আমরা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেবো।

সূচীপত্র

ভূমিকা

আমাদের সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এক বিরাট সংখ্যক ধর্ম বিশ্বাস এবং নৈতিক মতবাদের উপস্থিতি বিদ্যমান। মানুষ যুগ যুগ ধরে সৃষ্টির রহস্য ও তার কারণ জানার জন্য চেষ্টা করে এসেছে এবং এই সৃষ্টির মাঝে তার নিজের অবস্থান জানার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে।

আর্নল্ড টয়েনবী (Arnold Toynbee) মানব জাতির বিভিন্ন যুগের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করে গবেষণালব্ধ ফলাফল তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থে ১০টি বিরাট ভলিউমে বিস্তারিত প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর ইতিহাস গবেষণায় দেখিয়েছেন যে মানব জাতির ইতিহাসের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে ধর্ম। ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর The observer এ প্রকাশিত তাঁর এক নিবন্ধে তিনি বলেন, "আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে সৃষ্টির অস্তিত্বের রহস্যের চাবিকাঠি ধর্মের মাঝেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব।"

অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে ধর্মের অর্থ হচ্ছে "এক অতি মানবিক নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা বা সত্তায় বিশ্বাস করা, যে সত্তা ঈশ্বর বা দেবতা হিসেবে আনুগত্য এবং উপাসনা পাওয়ার অধিকারী"।

পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্মের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একজন চিরন্তন ঈশ্বর বা সর্বক্ষমতা সম্পন্ন ঐশী সত্তায় বিশ্বাস করা, যিনি চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। সকল প্রধান ধর্মের অনুসারীরাই বিশ্বাস করে যে, তারা যে ঈশ্বরের ইবাদত-বন্দেগী বা উপাসনা করে, তিনি সেই একই ঈশ্বর যাঁর পূজা অর্চনা অন্য ধর্মাবলম্বীরাও করে। মার্কসবাদ, ফ্রয়েডীয়তত্ত্ব এবং অন্যান্য ধর্ম বহির্ভূত মতবাদ পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমূহের মূল বিশ্বাসে আঘাত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরিণামে ধর্ম নির্মূলের এই সকল প্রচেষ্টা নিজেই এক সময় এক রকম ধর্ম বিশ্বাসের রূপ গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিউনিজম প্রচারের সময় এমন ঐকান্তিকতা ও উৎসাহ সহকারে তা করা হয়েছিল যা ধর্ম প্রচারের মত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। কাজেই এ

কথা বলা যায় যে, ধর্ম হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

"হে মুহাম্মদ (সা), আপনি তাদেরকে বলুন ঃ হে আহলে কিতাবগণ। তোমরা এমন একটি বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমানভাবে স্বীকৃত। আর তা হলো এই যে, আল্লাহ ছাড়া আমরা কারো ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে কাকেও অংশীদার করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাকেও পালনকর্তা সাব্যস্ত করব না। অতঃপর (এর পরেও) যদি তারা সত্য থেকে বিমুখ হয়, তবে তোমরা বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম অর্থাৎ উক্ত বিষয়সমূহের অনুগত। [আল কুরআন-৩ ঃ ৬৪]

বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। এতে আমার এই বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হয়েছে যে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে ন্যূনতম সহজাত বোধ সহকারেই প্রত্যেক মানব আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক গঠনই এরূপ হয় যে সে স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণাকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে, যদি না তার উপর বিপরীত কোন চাপ আসে। অন্য কথায়, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য কোন চাপের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করার জন্য চাপের প্রয়োজন হয়।

বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহের প্রকার বা শ্রেণীকরণ

বিশ্বের ধর্মসমূহকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সেমিটিক ধর্ম এবং অসেমিটিক ধর্ম। অসেমিটিক ধর্মসমূহকে আবার আর্য ও অনার্য ধর্ম এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. সেমিটিক ধর্মসমূহ

সেমিটিক জাতিসমূহের মধ্যে যে সকল ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলোই সেমিটিক ধর্ম। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে নবী হযরত নূহ (আ)-এর এক পুত্র ছিলেন 'শেম'। তাঁর অধঃস্তন বংশধরেরা সেমিটিক জাতি-গোষ্ঠী নামে পরিচিত। এই সেমিটিক জাতি গোষ্ঠীভুক্ত অর্থাৎ ইহুদী, আরব, আসিরীয়, ফিনিসীয় প্রভৃতি জাতিসমূহের মধ্যে যেসব ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছে সে ধর্মসমূহই সেমিটিক ধর্ম। প্রধান সেমিটিক ধর্ম হচ্ছে ইহূদী ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম এবং ইসলাম। এ সকল ধর্ম আল্লাহ প্রেরিত নবীদের দ্বারা প্রচারিত এবং নবীদের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী।

খ. অসেমিটিক ধর্মসমূহ

অসেমিটিক ধর্মসমূহকে আর্য এবং অনার্য এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

গ. আর্য শ্রেণীভুক্ত ধর্মসমূহ

আর্যদের মধ্যে উৎপত্তি লাভকারী ধর্মসমূহ আর্য ধর্মের শ্রেণীভুক্ত। আর্যরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষীর অন্তর্গত একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠী যারা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে (খৃষ্টপূর্ব ২০০০ হতে ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে) ইরান হয়ে উত্তর ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

আর্য শ্রেণীভুক্ত ধর্মসমূহকে আবার বেদান্ত এবং অবেদান্ত ধর্ম (vedic and non-vedic) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। বেদান্ত ধর্মকে নাম দেয়া হয় হিন্দু বা ব্রাহ্মণ ধর্ম। আর অবেদান্ত ধর্মসমূহের মধ্যে আছে শিখ ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম প্রভৃতি। এই আর্য ধর্মসমূহ কোনটিই নবী ভিত্তিক নয়।

জরাথ্রুস্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত জুরাথ্রুস্ট্রবাদ বা জোরোষ্ট্রিয়ানিজম একটি আর্য শ্রেণীভুক্ত এবং অবেদান্ত ধর্ম। এটি হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। জুরাথ্রুস্ট্র অনুসারীরা তাদের ধর্মকে নবী ধর্ম বলে দাবী করে।

ঘ. অনার্য ধর্মসমূহ

অনার্য ধর্মসমূহের উৎপত্তির উৎস বিভিন্ন। কনফুসীয় এবং তাও মতবাদের উৎস চীন, অন্যদিকে শিনতো মতবাদের (Shintoism) উৎস জাপান। অনার্য ধর্মসমূহের বেশির ভাগেরই আল্লাহ বা ঈশ্বর সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। এগুলোকে ধর্ম না বলে বরং নৈতিক বিশ্বাস আখ্যায়িত করাই ভাল।

কোন ধর্মে ঈশ্বরের প্রকৃত সংজ্ঞা

কোন ধর্মে ঈশ্বরের যে প্রকৃত ধারণা তা ঐ ধর্মের অনুসারীদের অনুসরণকৃত আচার-অনুষ্ঠান দেখেই সবসময় বিচার করা যায় না। অনেক ধর্মেরই বেশির ভাগ অনুসারী তাদের মূল ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত থাকে না। কাজেই যে কোন ধর্মে ঈশ্বরের সঠিক ধারণা পাওয়ার ক্ষেত্রে সে ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থসমূহকেই বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এবার আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান ধর্মসমূহের ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বর বা খোদা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে সেসব ধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা জানার চেষ্টা করবো।

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

আর্য ধর্মসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। প্রকৃত পক্ষে হিন্দু একটি পারস্য শব্দ এবং হিন্দু শব্দ দ্বারা সিন্ধু উপত্যাকা এলাকার অধিবাসীদের বুঝানো হতো। বর্তমানে প্রচলিত অর্থে হিন্দু একটি সাধারণ ধর্মের নাম যার আওতায় অনেক শ্রেণীর ও অনেক বর্ণের বিভিন্ন বিশ্বাস আছে, যাদের অধিকাংশের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে বেদ, উপনিষদ এবং ভগবত গীতা।

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের সাধারণ ধারণা

হিন্দু ধর্ম সাধারণভাবে বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম হিসেবে পরিচিত। অধিকাংশ হিন্দুই এ কথার সত্যতা স্বীকার করেন এবং অসংখ্য দেবতার অস্তিত্বের বিশ্বাসের মাধ্যমে এ স্বীকৃতি প্রকাশ করেন। কোন কোন হিন্দু ত্রয়ী ঈশ্বর তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। আবার অনেক হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তবে শিক্ষিত হিন্দু যারা তাদের ধর্মগ্রন্থ ভালভাবে অধ্যায়ন করেছেন তারা জোর দিয়ে বলেন যে একজন হিন্দুর উচিত একজনমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করা এবং তাঁর উপাসনা করা।

মুসলমানদের বিশ্বাস থেকে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণার প্রার্থক্য হচ্ছে সাধারণ হিন্দুদের সর্বেশ্বর মতবাদে বিশ্বাস।

সর্বেশ্বর মতবাদ অস্তিত্ববান প্রত্যেক বস্তুকে, তা সে জীব হোক বা জড় হোক, পবিত্র এবং ঐশ্বরিক বলে বিবেচনা করে। সুতরাং হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা গাছপালা, সূর্য, চন্দ্র, পশু-প্রাণী এবং মানুষকে পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করে। সাধারণ হিন্দুদের মতে প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর। বিপরীত পক্ষে, ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, মানুষ নিজে এবং তার চারপাশের সমস্ত কিছুই খোদার সৃষ্টি, তারা নিজেরা কোন খোদায়ী সত্তা নয়। সুতরাং মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক বস্তু খোদার সৃষ্টি। অন্য কথায় প্রত্যেক বস্তুই খোদার অধীন। গাছপালা, সূর্য, চন্দ্র এবং এই মহাবিশ্বের যাবতীয় কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানাধীন। সুতরাং খোদায়ী ধারণার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম বিশ্বাসের প্রধান পার্থক্য একটি বর্ণের (কিন্তু তার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বিপরীত)। হিন্দুরা বলে প্রত্যেক বস্তুই খোদা, আর মুসলমানরা বলে "প্রত্যেক বস্তুই খোদার (অর্থাৎ খোদার সৃষ্টি ও মালিকানাধীন)।

পবিত্র কুরআন বলে,

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ.

"এসো, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে একটি সাধারণ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌছি। সাধারণ ঐক্যমতের বিষয় এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করি না।" [আল কুরআন-৩ : ৬৪]

এখানে সাধারণ ঐক্যমতের কথা বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করি না।

এখন আমরা হিন্দু এবং ইসলামী ধর্ম গ্রন্থ বিশ্লেষণ করে উভয় ধর্মের মধ্যে ঐক্যমতের বিষয়টি খুঁজে দেখার চেষ্টা করি।

ভগবত গীতা

হিন্দুদের সকল ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ভগবতগীতা। গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি বিবেচনা করে দেখুন ঃ

"তারা, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বস্তুগত আকাঙ্ক্ষার দ্বারা বিলুপ্ত হয়েছে, বিভিন্ন উপদেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে উপাসনার বিশেষ নিয়মনীতি অনুসরণ করে।

[ভগবত গীতা, অধ্যায়-৭, শ্লোক-২০ (ভগবতী গীতা ৭ ঃ ২০)]

এখানে গীতা বস্তুবাদী লোকদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছে যারা বস্তুবাদী এবং প্রকৃত ঈশ্বর বাদ দিয়ে অন্য উপ-দেবতাদের উপাসনা করে।

উপনিষদসমূহ

উপনিষদসমূহকেও হিন্দুগণ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রূপে বিবেচনা করে থাকেন। উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ বিবেচনা করুন ঃ

১। "একমে বাদ্বিতীয়াম"

"তিনি এক একক, যাঁর কোন দ্বিতীয় নাই।" [চান্দোগ্য উপনিষদ ৬ ঃ ২ ঃ ১]

২। উপনিষদের নিম্নের শ্লোকটিও দেখুন ঃ

"ন-কস্য কাসূজ জানিতা ন কাধিপাহ"

"তাঁর কোন পিতামাতা নাই, কোন প্রভুও নাই।"

[সেভতাসাভাতারা উপনিষদ ৬, ৯, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২৬৩]

৩। উপনিষদের আরো শ্লোক দেখুন ঃ

"ন তস্য প্রতিমা আসতি"

"তাঁর সমতুল্য কেহ নাই"

[সেভতাসাভাতারা উপনিষদ, অধ্যায় ৪ ঃ ১৯]

"নৈনম উরধভাম ন তির্য্যানকাম ন মাধ্য ন পারিজাগ্রাভাত না তাসি প্রতিমে আস্তি যস্যনামা মাহাদ যাসাহ"

"তাঁর সমতুল্য কেউ নাই, যাঁর নাম মহা গৌরবের।"

(এস. রাধা কৃষ্ণান কৃত The principal Upanishad, পৃ. ৭৩৬ এবং ৭৩৭)

[Sacred Books of the East, Volume 15, Upanishad part 11, Page no 253]

উপনিষদের উপরোল্লিখিত শ্লোকসমূহ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের সাথে তুলনা করে দেখুন।

وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ.

"এবং তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।" [আল কুরআন-১১২ ঃ ৪]

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"তাঁর সমতুল্য আর কোন কিছুই নেই।" [আল কুরআন-৪২ ঃ ১১]

৪। ঈশ্বরকে কোন বিশেষ আকারে কল্পনা করার বিষয়ে উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে মানুষের অক্ষমতা তুলে ধরা হয়েছে ঃ

"না সমুদ্রসে তিস্থাতি রূপম অ্যাস্যা, ন কাকসুসা পাস্যতি কাস ক্যানাইয়াম।হৃদা হৃদিস্থাম মানাসা য়া এনাম, এভাম ভিদুর আমর্তাস তে ভবন্তি।"

"তাঁর আকার বা রূপ দেখা যায় না; কেউ তাঁকে চোখ দিয়ে দেখতে পারে না। যারা হৃদয় এবং মন দিয়ে তাঁকে হৃদয়ে উপলব্ধি করে, তারাই অমর হয়।"

[সেভতাসভাতারা উপনিষদ, অধ্যায় ৪ ঃ ২০]

পবিত্র কুরআনে এই রূপ বিষয় নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

"কোন দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারে না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সবার উপরে। তিনি সকল উপলব্ধির উপরে, অথচ তিনি সকল জিনিসের বিষয়ে অবগত।"

[আল কুরআন- ৬ ঃ ১০৩]

বেদ

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে বেদকে সর্বাপেক্ষা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বিবেচনা করা হয়। প্রধান বেদ ৪টি। যথা- ঋগ বেদ, যজুর্বেদ, সাম বেদ এবং অথর্ব বেদ।

১। যজুর্বেদ ঃ

(i) যজুর্বেদ এর এই শ্লোকটি বিবেচনা করুন ঃ

"ন তস্য প্রতিমা আস্তি"

"তাঁর কোন আকার নাই"

[যজুর্বেদ, ৩২ ঃ ৩]

এতে আরো বলা হয়েছে "তিনি অজাত, তাই তিনি আমাদের উপাসনার অধিকারী"।

"তাঁর কোন আকার নেই, নিশ্চয়ই তাঁর গৌরব বিরাট। তিনি তাঁর ভিতর ধারণ করেন সকল উজ্জ্বল বস্তু, যেমন– সূর্য ইত্যাদি। আমার প্রার্থনা তিনি যেন আমার ক্ষতি না করেন। তিনি অজাত, তিনি আমাদের উপাসনার অধিকারী।"

[যজুর্বেদ, by Devi chand, এম. এ. পৃ. ৩৭৭]

(ii) "তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং তিনি পবিত্র।" [যজুর্বেদ, ৪০ ঃ ৮]

"তিনি উজ্জ্বলতায় সমাসীন। তিনি অমূর্ত নিরাকার, শরীরবিহীন এক পবিত্র সত্তা, যাকে কোন অশুভ ভেদ করে নাই। তিনি সুদূরদর্শী, প্রজ্ঞাময়, সর্বব্যাপী সয়ম্ভু, যিনি যথার্থভাবে অনন্ত সময়ের জন্য লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করেছেন।"

[যজুর্বেদ- ৪০ ঃ ৮])

(iii) যজুর্বেদে আরো বলা হয়েছে ঃ

"আন্ধাতামা প্রাভিশান্তি ইয়ে অসম্ভূতি মুপাসতে"।

"তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, যারা প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের পূজা করে" যেমন বাতাস, পানি, আগুন প্রভৃতি। তারা মহা অন্ধকারে প্রবেশ করে, যারা সম্ভূতি পূজা করে অর্থাৎ সৃষ্টি বস্তু যেমন, টেবিল, চেয়ার, মূর্তি ইত্যাদি।"

[যজুর্বেদ- ৪০ ঃ ৯]

(iv) যজুর্বেদে নিম্নরূপ একটি প্রার্থনা উল্লেখিত হয়েছে ঃ

"আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত কর এবং সে পাপকে দূরে সরিয়ে দাও যা আমাদিগকে বিপথগামী করে।"

(যজুর্বেদ অধ্যায় ঃ ৪০ ঃ ১৬)

২। অথর্ব বেদ

(i) অথর্ব বেদের নিম্নোক্ত শ্লোকটি বিবেচনা করুন ঃ

"দেব মাহা ওসি"

"ঈশ্বর নিশ্চয়ই মহান" (অথর্ব বেদ-২০/৫৮ ঃ ৩)

"নিশ্চয়ই, সূর্য তুমি মহান, নিশ্চয়ই, আদিত্য তুমি মহান। তুমি যেমন মহান, তেমনই তোমার মহত্ব প্রশংসার দাবীদার; নিশ্চয়ই তুমি মহান হে ঈশ্বর।"

(অথর্ব বেদ, সংহিতি ভলিউম-২, উইলিয়াম ডিমাইট হুইটনি, পৃ. ৯১০)

পবিত্র কুরআনের সূরা রাদ-এ অনুরূপ অর্থের একটি আয়াত আছে ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ.

'তিনিই মহান, তিনিই শ্রেষ্ঠ।' [আল কুরআন-১৩ ঃ ৯)

৩। ঋগ বেদ

(i) সকল বেদের মধ্যে ঋগ বেদ প্রাচীনতম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ঋগ বেদকে সবচেয়ে পবিত্র বিবেচনা করেন। ঋগ বেদে উল্লেখ আছে,

"বিজ্ঞ পুরোহিতগণ এক ঈশ্বরকে বহু নামে ডাকেন"

[ঋগ বেদ-১ ঃ ১৬৪ ঃ ৪৬]

(ii) ঋগ বেদে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি কম করে হলেও ৩৩টি বিভিন্ন গুণাবলী আরোপ করা হয়েছে, যার অধিকাংশ উল্লেখিত হয়েছে ঋগ বেদ বুক-২, স্তোত্র-১-এ।

ঋগ বেদে ঈশ্বরের প্রতি আরোপিত যে সমস্ত গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি সুন্দর নাম ঋগ বেদ সুবহ ১১ শ্লোক ৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে "ব্রহ্মা"। "ব্রহ্মা" অর্থ 'স্রষ্টা'। আরবী ভাষায় স্রষ্টার প্রতিশব্দ "খালেক"। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে "খালেক" বা স্রষ্টা (বা ব্রহ্মা) হিসেবে অভিহিত করলে মুসলমানদের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে মুসলমানরা অবশ্যই একথা স্বীকার করে না

যে ব্রহ্মাই ঈশ্বর যার বারটি মাথা আছে (নাউযু বিল্লাহ)। মুসলমানরা অবশ্যই একথার ঘোর বিরোধী।

সর্বক্ষমতাময় ঈশ্বরের উপর মনুষ্য গুণাবলী আরোপ করে তাঁকে ব্যাখ্যা করা যজুর্বেদের নিম্নলিখিত শ্লোকের পরিপন্থী ঃ

"ন- তস্য প্রাতিমা আস্তি"

(তাঁর কোন মূর্ত আকার নাই)

(যজুর্বেদ- ৩২ ঃ ৩)

ঋগ বেদ পুস্তক ২, স্তোত্র ১ শ্লোক ৩ (ঋগ বেদ ২ ঃ ১ ঃ ৩) আরেকটি সুন্দর গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছে 'বিষ্ণু"। অর্থ 'প্রতিপালক'। আরবী ভাষায় অনুবাদ করলে এর প্রতিশব্দ দাঁড়ায় "রব"। এখানেও মুসলমানদের কোন আপত্তি থাকার কথা নয় যদি সর্বক্ষমতায় আল্লাহ বা ঈশ্বরকে "রব" বা প্রতিপালক (তথা বিষ্ণু) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিষ্ণু সম্পর্কে হিন্দুদের প্রচলিত ধারণা এই যে, তাঁর ৪টি হাত আছে, ডান দিকের একটি হাতে "চক্র" এবং বাম দিকের একটি হাতে শংখ ধারণ করে আছেন, এবং পাখিদের পৃষ্ঠে আরোহণকারী কিংবা সর্প আসনে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট আছেন।

মুসলমানরা কখনো ঈশ্বরের কোন মূর্তি কল্পনা করতে পারে না। হিন্দুদের এই প্রচলিত ধারণা যজুর্বেদের অধ্যায় ৪০, শ্লোক ১৯ এর বিরোধী।

(iii) ঋগ বেদের নিম্নের শ্লোকটিও দেখুন ঃ

"মা চিদান্যাদভি শাংসাতা"

অর্থাৎ "হে বন্ধুগণ, সেই একমাত্র ঐশী সত্তা ছাড়া আর কারো উপাসনা করো না"

[ঋগ বেদ, পুস্তক ৮ ঃ ১ ঃ ১]

[ঋগ বেদ সংহিতি, ভলিউম-১১, পৃষ্ঠা-১ ও ২। স্বামী সত্য প্রকাশ স্বরস্বতি এবং সত্যকাম বিদ্যালংকার।]

(iv) "জ্ঞানী যোগিরা তাদের হৃদয় ও মন দিয়ে সে সর্বোচ্চ সত্তার ধ্যান করেন যিনি সর্বত্র বিরাজিত, মহান এবং সর্বজ্ঞ। একমাত্র তিনি তাদের কাজ সম্পর্কে অবহিত বিধায় সকল ইন্দ্রিয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাদের নিজ নিজ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। নিশ্চয়ই, শ্রেষ্ঠ গৌরব সে মহান স্রষ্টার।"

[ঋগ বেদ-৫ ঃ ৮১]

[ঋগ বেদ, সংহিতি, ভলিউম ৬, পৃষ্ঠা ১৮০২ এবং ১৮০৩, স্বামী সত্য প্রকাশ স্বরস্বতী এবং সত্যকাম বিদ্যালংকার]

হিন্দু বেদান্ত এর ব্রহ্মা সূত্রা ঃ

হিন্দু বেদান্ত-এর ব্রহ্মা সূত্রা নিম্নরূপ ঃ

"একাম ব্রহাম, ডিতিয়া নাস্তে নেহ না নাসতে কিনচান"

"ঈশ্বর, কেবলমাত্র একজন, দ্বিতীয় কেউ নেই; কেউ নেই, কেউ নেই, মোটেই কেউ নেই।"

হিন্দু মূল ধর্ম গ্রন্থের উপরোল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম গ্রন্থসমূহের কেবলমাত্র নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা দ্বারা হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের সঠিক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

শিখ ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

শিখ ধর্ম একটি অসেমিটিক, আর্য, অ-বেদান্ত ধর্ম। এটি পৃথিবীর প্রধান ধর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এটি হিন্দু ধর্মের একটি শাখা বা অপভ্রংশ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গুরু নানক কর্তৃক শিখ ধর্ম প্রবর্তিত হয়। বর্তমান পাকিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব এলাকায় এ ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে। এ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা গোত্র) হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

শিখ শব্দ এবং শিখ মতের অর্থ

শিখ শব্দটি এসেছে শিষ্য শব্দ হতে যার অর্থ অনুসারী বা সমর্থক। শিখ মতবাদ হচ্ছে ১০ গুরুর ধর্ম ঃ যার প্রথম গুরু নানক এবং দশম ও শেষ গুরু হচ্ছেন গুরু গোবিন্দ সিং। শিখ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হচ্ছে শ্রী গুরু গ্রন্থ, যার আরেক নাম আদি গ্রন্থ সাহেব।

পঞ্চ-'ক'

প্রত্যেক শিখকে পাঁচটি 'ক' ধারণ করতে হয়, যেগুলি তার ধর্মীয় পরিচিতিও বহন করে। এ পাঁচটি 'ক' নিম্নরূপ ঃ

(১) কেশ– অকর্তিত চুল। সকল গুরু কেশ রাখতেন।

(২) কংখ– চিরুনী। চুলকে পরিষ্কার তথা পরিপাটি রাখতে ব্যবহৃত হয়।

(৩) কড়া– ধাতব বা ইস্পাত তৈরি কংকন বা বায়ুবন্দ। শক্তি এবং আত্মা সংযমের জন্য।

(৪) কৃপাণ- তরবারি। আত্মরক্ষার জন্য।

(৫) কাচ্চা- হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বিশেষ পরিধেয় অন্তর্বাস।

মূলমন্ত্র ঃ শিখ ধর্ম বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি

শিখ ধর্ম মতে ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে একজন শিখ সর্বোত্তম যে সংজ্ঞা দিতে পারে, তা হলো এই মূলমন্ত্র পাঠ করা –যা শিখ ধর্ম বিশ্বাসের মূল ভিত্তি, যা গুরু গ্রন্থ সাহেবের প্রারম্ভেই উল্লেখিত হয়েছে। গুরু গ্রন্থ সাহেবের ভলিউম-১, জাপুজি, প্রথম শ্লোক নিম্নরূপ ঃ.

"ঈশ্বর কেবলমাত্র একজনই, তিনি পরম সত্য, তিনিই স্রষ্টা, সকল ভয় এবং ঘৃণা থেকে মুক্ত; তিনি অমর এবং কারো জাত নন; তিনি স্বয়ম্ভু, মহান এবং দয়াময়।"

শিখ ধর্ম কঠোরভাবে একেশ্বরবাদ অনুসরণ করে। শিখ ধর্ম সর্বক্ষমতাময় এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যাঁর প্রকাশ্য কোন আকার নেই, যাঁকে বলা হয় "ইক ওমকারা।"

প্রকাশ্য নামে তাঁকে বলা হয় ওংকারা এবং তাঁর কতকগুলো গুণাবলী নিম্নরূপ ঃ

করতার = যিনি স্রষ্টা

সাহিব = মহাপ্রভু

আকাল = চিরন্তন

সত্যানামা = পবিত্রনাম

পরওয়ারদিগার = পালনকারী

রাহীম = দয়ালু

কারীম = উপকারী

এছাড়াও তাঁকে আরো বলা হয় "অহে গুরু"-একমাত্র মহাসত্য প্রভু।

শিখ ধর্ম মত কঠোরভাবে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। এ ধর্ম অবতারবাদে অর্থাৎ সৃষ্টির রূপ ধারণ করে স্রষ্টার আগমনে বিশ্বাস করে না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজে কখনো কারো রূপ ধারণ করে অবতার রূপে পৃথিবীতে আগমন করে না। এ ছাড়াও শিখ ধর্ম কঠোরভাবে মূর্তি পূজার বিরোধী।

গুরু নানকের উপর কবীরের প্রভাব

সাধু পুরুষ কবিরের শিক্ষার দ্বারা গুরু নানক এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, শ্রী গুরু নানক সাহিব গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়ে মহাপুরুষ কবিরের শ্লোক উল্লেখিত হয়েছে। কবিরের এরূপ একটি বিখ্যাত শ্লোক নিম্নরুপ ঃ

"দুখ মেঁই সুমিরানা সাব কারেঁই
সুখ মেঁই কারেঁই না কোয়া
জো সুখ মেঁই সুমিরানা কারেঁই
তো দুখ কায়ে হোয়ে"

বঙ্গানুবাদ

"দুঃখের সময় সকলেই ঈশ্বরকে স্মরণ করে, কিন্তু সুখ ও শান্তির সময় কেউ তাঁকে স্মরণ করে না। সুখ ও শান্তির সময় যে ঈশ্বরকে স্মরণ করে দুঃখ তার থাকবে কেন?"

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে উপরোক্ত বাক্যের মিল দেখুন ঃ

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ.

"যখন কোন বিপদ মানুষের কাছে উপস্থিত হয়, তখন সে তার প্রভুকে ডাকতে থাকে এবং অনুশোচনার সাথে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, কিন্তু যখন তার প্রভুর তরফ থেকে তার উপর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, তখন সে ব্যক্তি তার কাছে যে জন্য প্রার্থনা করছিল এবং তাঁকে ইতোপূর্বে ডাকছিল, তা সে ভুলে যায় এবং আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করতে থাকে।"

[আল কুরআন-৩৯ ঃ ৮]

জরাথুষ্ট্রীয় ধর্ম মতে ঈশ্বরের ধারণা

জরাথুষ্ট্রবাদ একটি প্রাচীন আর্য ধর্ম। ২৫০০ বছরেরও আগে পারস্য দেশে এ ধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল। যদিও তুলনামূলকভাবে এ ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা সারা পৃথিবীতে এক লক্ষ ত্রিশ হাজারেরও কম, কিন্তু এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মসমূহের অন্যতম। ইরান দেশীয় পয়গম্বর জোরোস্টার বা জরাথুস্ত্র এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। সাধারণভাবে এই ধর্ম পার্সী ধর্ম নামে পরিচিত। পার্সীদের পবিত্র ধর্ম– গ্রন্থ দাসাতির এবং আভেস্তা।

জরাথুষ্ট্রীয় ধর্মে ঈশ্বরকে ডাকা হয় "আহুরা মাযদা" নামে। 'আহুরা' অর্থ প্রভু এবং 'মাযদা' অর্থ প্রজ্ঞাময়। অতএব, "আহুরা মাযদা" অর্থ প্রজ্ঞাময় মহাপ্রভু। অথবা প্রজ্ঞাময় ঈশ্বর। এই ধর্মবিশ্বাস মতে "আহুরা মাযদা" কঠোরভাবে এক ঈশ্বর বা এক প্রভুর সমার্থক।

দাসাতির ধর্মগ্রন্থ অনুসারে ঈশ্বরের গুণাবলী ঃ

দাসাতির গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী "আহুরা মাযদা" নিম্নলিখিত গুণাবলীর অধিকারী ঃ

(১) তিনি এক ও একক।

(২) কোন কিছুই তাঁর সমকক্ষ নয়।

(৩) তিনি অনাদি এবং অনন্ত; তাঁর আরম্ভ নাই, শেষও নাই।

(৪) তাঁর পিতামাতা নাই; স্ত্রী কিংবা সন্তান-সন্ততি নাই।

(৫) তাঁর কোন শরীক কিংবা আকার নাই।

(৬) তাঁকে কোন চোখ দর্শন করতে পারে না; কারো চিন্তা শক্তি তাকে উপলব্ধি করতে পারে না।

(৭) তিনি মানুষের সকল কল্পনার উর্ধ্বে।

(৮) তিনি মানুষের নিজের চেয়েও আরো বেশি নিকটবর্তী।

আভেস্তায় বর্ণিত ঈশ্বরের গুণাবলী ঃ

আভেস্তা গ্রন্থে "আহুরা মাযদার" কতিপয় গুণাবলী নিম্নরূপ গাঁথা ও য়াসনায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

(১) তিনি স্রষ্টা

(য়াসনা ৩১ ঃ ৭ এবং ১১); (য়াসনা ৪৪ ঃ ৭), (য়াসনা ৫০ ঃ ১১), (য়াসনা ৫১ ঃ ৭)

(২) সর্বক্ষমতাময় - সর্ব শক্তিমান।

(য়াসনা ৩৩ ঃ ১১), (য়াসনা ৪৫ ঃ ৬)

(৩) কল্যাণকারী - 'হুদাই'।

(য়াসনা ৩৩ ঃ ১১); (য়াসনা ৪৮ ঃ ৩)

(৪) প্রাচুর্যময় - '(স্পেনটা)'

(য়াসনা ৪৩ ঃ ৪,৫,৭,৯,১১,১৩,১৫); (য়াসনা ৪৪ ঃ ২)

(য়াসনা ৪৫ ঃ ৫) (য়াসনা ৪৬ ঃ ৯) (য়াসনা ৪৮ ঃ ৩)।

ইহুদী ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

ইহূদী ধর্ম প্রধান সেমিটিক ধর্মসমূহের অন্যতম। এ ধর্মের অনুসারীরা ইহূদী (Jews) হিসেবে পরিচিত এবং তারা মূসা নবী (আ) এর নবুওয়াতে বিশ্বাসী।

(১) দিউতেরোনোমি হতে গৃহীত নিম্নের শ্লোকটি ইসরাঈলীদের প্রতি নবী মূসা (আ) এর উপদেশ এবং শিক্ষা ঃ

"শামা ইসরায়েলু আদোনাই ইলা হায়নো আদনা ইখাদ"

এটি একটি হিব্রু উক্তি যার অর্থ ঃ "হে ইসরাঈলীগণ, শ্রবণ কর ঃ আমাদের প্রভু এক ঈশ্বর, তিনি অদ্বিতীয়"।

[বাইবেল, দিউত-৬ ঃ ৪]

(২) বাইবেলের পুস্তক ইসাইয়াহ্ থেকে নিম্নের শ্লোকটি দেখুন ঃ

"আমি, আমিই তোমাদের প্রভু, আমি ছাড়া কোন ত্রাণকর্তা নাই"

[বাইবেল, ইসাইয়াহ-৪৩ ঃ ১১]

(৩) আমিই প্রভু, অন্য কেউ নয়। আমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নাই।

[বাইবেল, ইসাইয়াহ-৪৫ ঃ ৫]

(৪) আমিই ঈশ্বর, আমি ছাড়া অন্য কেউ নয়, আমি ঈশ্বর, আমার সমকক্ষ কেউ নাই।

[বাইবেল, ইসাইয়াহ-৪৬ ঃ ৯]

(৫) ইহূদী ধর্ম নিম্নের বাক্যসমূহে মূর্তি পূজাকে নিষিদ্ধ করেছে ঃ

"আমার সাক্ষাতে তোমার যেন অন্য কোন দেবতা না থাকে। তুমি নিজের নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করো না। উর্ধ্বলোকে স্বর্গে, নিম্নে পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নীচস্থ পানির তলদেশে যা যা থাকে তাদের অনুরূপ কোন মূর্তি নির্মাণ করো না। তুমি তাদের সামনে প্রণিপাত করো না, কিংবা তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমার প্রভু, তোদের ঈশ্বর, আমি সগৌরব রক্ষণে উদযোগ গী ঈশ্বর)।"

[বাইবেল, প্রস্থান পুস্তক-২০ ঃ ৩-৫]

(৬) ঠিক একই রকম বাক্য পুনরোল্লেখ হয়েছে দিউতেরোনোম পুস্তকে ঃ

"আমার সাক্ষাতে তোমার যেন অন্য কোন দেবতা না থাকে। তুমি নিজের নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করো না। উর্ধ্বলোকে স্বর্গে, নিম্নে পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নীচস্থ পানির তলদেশে যা যা থাকে তাদের অনুরূপ কোন মূর্তি নির্মাণ করো না। তুমি তাদের সামনে প্রণিপাত করো না, কিংবা তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমার প্রভু, তোদের ঈশ্বর, আমি সগৌরব রক্ষণে উদযোগ গী ঈশ্বর)।"

[বাইবেল, দিউত-৫ ঃ ৭-৯]

খৃষ্ট ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

খৃষ্ট ধর্ম একটি সেমিটিক ধর্ম। খৃষ্টানরা দাবী করেন, সারা পৃথিবীতে দুইশত কোটিরও বেশি তাদের ধর্মের অনুসারী রয়েছে। যীশুখৃস্টের (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) নামানুসারে এই ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। যীশু বা ঈসা (আ) ইসলাম ধর্মেও একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। খৃষ্ট ধর্মের বাইরে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যেখানে ঈসা (আ) কে নবী হিসাবে বিশ্বাস ও সম্মান করা হয়।

(১) খৃষ্ট ধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা আলোচনা করার পূর্বে আসুন আমরা ইসলাম ধর্মে ঈসা (আ)-এর মর্যাদার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখি। খৃষ্ট ধর্মের বাইরে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যেখানে ঈসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। ঈসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া কোন মুসলমানই প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না।

(২) আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈসা (আ) মহান আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত অন্যতম প্রধান রাসূল (সা) ছিলেন।

(৩) আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি কোন পিতা ছাড়া অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে বিষয়টি বর্তমান যুগে অনেক খৃষ্টান বিশ্বাস করেন না।

(৪) আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মৃতদেরকে জীবিত করতে পারতেন।

(৫) আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধকে দৃষ্টি দান করতে এবং কুষ্ঠরোগীকে ভাল করতে পারতেন।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে, যদি মুসলিম এবং খৃষ্টান উভয়ই ঈসা (আ) কে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করে তাহলে উভয়ের মধ্যে বিরোধটি ঠিক কোন জায়গায়? ইসলাম এবং খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে ঈসা (আ)-এর উপর খৃষ্টানদের অনুমান ভিত্তিক দেবত্ব আরোপের বিষয়টিতে তাদের গুরুত্ব প্রদান করা। খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, ঈসা (আ) কখনোই নিজের দেবত্ব দাবী করেননি। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র বাইবেলের কোথাও এরূপ দ্ব্যর্থহীন একটি বাক্যও নেই, যেখানে ঈসা (আ) নিজে বলেছেন, 'আমি খোদা; কিংবা বলেছেন, "আমার উপাসনা

কর"। বাস্তবে বাইবেলে ঈসা (আ)-এর নামে আরোপিত এইরূপ বর্ণনা রয়েছে, যেখানে তিনি বরং এর বিপরীত কথা প্রচার করেছেন। বাইবেলে ঈসা (আ)-এর উক্তি হিসেবে উল্লেখিত নিম্নলিখিত বর্ণনাসমূহ লক্ষ্য করুন ঃ

"আমার পরম পিতা আমার চেয়ে মহান।"

(যোহন-১৪ ঃ ২৮)

"আমার পরম পিতা সবার উপরে শ্রেষ্ঠ, মহত্তোমহীয়ান।"

[যোহন-১০ ঃ ২৯]

"আমি ঈশ্বরের শক্তির বলে অশুভ শয়তানকে বিতাড়িত করি"

[ম্যাথিউ-১২ ঃ ২৮]

"আমি পরমেশ্বরের অঙ্গুলি হেলনে শয়তানকে বিতাড়িত করি।"

[লুক-১১ ঃ ২০]

"আমি আমার নিজের থেকে কিছু করতে পারি না, যা আমি শুনি তা আমি বলি; আমি যা করি সঠিক করি; কারণ আমি আমার নিজের ইচ্ছা হতে কিছু করি না বরং পরম পিতার ইচ্ছাতেই করি, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।"

যীশু খৃষ্ট (ঈসা আ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ঃ

তিনি এসেছিলেন বিধান পরিপূর্ণ করতে ঃ

ঈসা (আ) নিজে কখনো খোদায়িত্ব দাবি করেননি। তিনি সুস্পষ্টভাবে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন। ঈসা (আ)-কে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেন পূর্ববর্তী তাওরাতী বিধানের নিশ্চয়তা প্রদানকারী হিসেবে। এর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যীশু খৃষ্ট (আ)-এর বক্তব্য হিসেবে উল্লেখিত ম্যাথিউ লিখিত গসপেল এর নিম্নলিখিত বর্ণনায় ঃ

"এ কথা মনে করো না যে আমি পূর্বের নবীদেরকে কিংবা তাঁদের বিধানকে ধ্বংস করতে এসেছি; আমি ধ্বংস করতে নয় বরং তাঁদের পরিপূর্ণ করতে এসেছি। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সত্য বলছি, যতদিন ঊর্ধ্বলোক এবং মর্ত্যলোক বিলুপ্ত না হয়, যতদিন সমস্ত পরিপূর্ণ না হয়, ততদিন বিধান ব্যবস্থার ক্ষুদ্র অনুমাত্র বিলুপ্ত হবে না।

অতএব, যে কেউ এসব বিধান আজ্ঞার কিছুমাত্র লঙ্ঘন করবে বা শিথিলতা

প্রদর্শন করবে অথবা লঙ্ঘন বা শিথিল করার শিক্ষা প্রদান করবে, তাদেরকে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্ররূপে গণ্য করা হবে; কিন্তু যে কেউ সে সকল বিধান পালন করবে ও শিক্ষা প্রদান করবে, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহানরূপে আখ্যায়িত করা হবে।"

[বাইবেল, ম্যাথিউ-৫ ঃ ১৭-২০]

ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেন ঃ

যীশু খৃষ্ট (ঈসা) আলাইহিস সালামের পৃথিবীতে আগমনের নবুওয়াতী উদ্দেশ্যের কথা বাইবেলের নিম্নলিখিত বাক্যে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

"আর যে বাক্য শ্রবণ কর, তা আমার নয় বরং পরম পিতার যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।"

[বাইবেল, যোহন-১৪ ঃ ২৪]

"আর অনন্ত জীবন হলো, তোমাকে অর্থাৎ একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, আর তুমি যাঁকে প্রেরণ করেছো সেই যীশু খৃষ্টকে জানা।"

[বাইবেল, যোহন-১৭ ঃ ৩]

ঈসা (আ) তাঁর নিজের খোদায়িত্বের বিষয়ে এমনকি দূরতম ইঙ্গিতও নাকচ করে দিয়েছেন। বাইবেলে উল্লেখিত নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবেচনা করুন ঃ

"এবং দেখো, এক ব্যক্তি আগমন করলো এবং তাঁর কাছে বললো, হে মহান প্রভু, আমি কী ভাল কাজ করব, যাতে আমি অমর জীবন লাভ করতে পারি?"

"এবং তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি আমাকে কেন মহান বলে সম্বোধন কর? একমাত্র সেই প্রভু ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ মহান নয়, কিন্তু তুমি যদি সেই জীবনে প্রবেশ করতে চাও, তাহলে বিধানসমূহ মেনে চলো।"

ঈসা (আ)-এর খোদায়িত্ব এবং তাঁর আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে মানব জাতির মুক্তি লাভের বিষয়ে বর্তমান খৃষ্টানগণ যে মতবাদে বিশ্বাস করেন, বাইবেলের উপরোক্ত বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে তাকে খণ্ডন করছে।

বাইবেলের বর্ণনায় ঈসা (আ)-এর স্পষ্ট বক্তব্য দেখা যায় যে তিনি মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে ঐশী আদেশ ও বিধানসমূহ অনুসরণ করার উপর জোর দিয়েছেন।

[বাইবেল, ম্যাথিউ-৫ ঃ ১৭-২০]

নাজারাথ এর ঈসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত ব্যক্তি ঃ

বাইবেলের নিম্নোক্ত বিবরণ ঈসা (আ) সম্পর্কে ইসলামের যে বিশ্বাস অর্থাৎ ঈসা (আ) ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসূল (সা), এ বক্তব্যকে সমর্থন করে।

"হে ইসরাঈলীগণ, এই কথাসমূহ শ্রবণ কর ঃ নাজারাথের ঈসা (আ) তোমাদের মধ্য থেকে খোদার মনোনীত ব্যক্তি, খোদা যাঁকে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন, অলৌকিক ক্ষমতা এবং ঐশী নিদর্শনসহ, যা তোমরা নিজেরাও জানো।"

নবী মূসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ তৌরাতীয় বিধানের প্রথম বিধান ছিল এই যে, ঈশ্বর বা খোদা একজন ঃ

বর্তমান খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদকে বাইবেল আদৌ সমর্থন করে না। একবার একজন তৌরাতীয় ধর্মযাজক ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, প্রথম বিধান কোনটি? এর উত্তরে ঈসা (আ) শুধু সে কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন যা মূসা (আ) বলেছিলেন, অর্থাৎ ঃ

"শামা ইসরায়েলু আদোনাই ইলা হায়নো আদনা ইখাত।"

এটি হিব্রু ভাষার একটি উক্তি, যার অর্থ, "শুন হে ইসরাঈল, আমাদের প্রভু ঈশ্বর, তিনি এক ঈশ্বর।"

[বাইবেল, মার্ক-১২ ঃ ২৯]

ইসলামে আল্লাহর ধারণা

ইসলাম একটি সেমিটিক ধর্ম। পৃথিবী ব্যাপী এর ১২০ কোটিরও বেশি অনুসারী আছে। ইসলাম অর্থ "আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ"। মুসলমানরা কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসাবে বিশ্বাস করে যা রাসূল মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে আল্লাহর একত্ববাদ এবং পরকালীন জীবনে মানুষের জবাবদিহিতার শিক্ষা দিতে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। ইসলাম পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের উপর বিশ্বাসকে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিধান হিসাবে নির্ধারণ করেছে। এইভাবে হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে হযরত নূহ, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, দাউদ, যোহন, ঈসা (আলাইহিস সালাম)সহ সকল নবী রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন ইসলামে ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর অতিসংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আল্লাহ তা'আলার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে কুরআন মাজীদের সূরা ইখলাসের ৪টি আয়াতে। কুরআনের ১১২তম সূরা ইখলাসের আয়াত ৪টি নিম্নরূপ ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدًا.

(১) "আপনি তাদেরকে বলে দিন, তিনি আল্লাহ্ একক"

(২) "আল্লাহ্ পরম, কারো মুখাপেক্ষী নন,"

(৩) "তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নাই, তিনি কারো সন্তান নন,"

(৪) "এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নাই।"

[আল কুরআন-১১২ ঃ ১-৪]

উপরে দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত 'আস সামাদ' শব্দটির সঠিক অনুবাদ করা কঠিন। এর অর্থ "পরম সত্তা,", যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আরোপ করা যায়। আল্লাহ ছাড়া আর সকল সত্তার অস্তিত্ব সময়ানুগত এবং শর্তাধীন বা আপেক্ষিক। এ নাম দ্বারা আরো বুঝায় আল্লাহ্ অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা কোন কিছুরই উপর নির্ভরশীল নন বা কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সকল ব্যক্তি ও বস্তুই তাঁর উপর নির্ভরশীল।

সূরা ইখলাস : ধর্মের মূলতত্ত্বের কষ্টিপাথর

আল কুরআনের ১১২তম সূরা, সূরা ইখলাস Theology বা ধর্মের মূলতত্ত্বের কষ্টিপাথর। গ্রীক ভাষায় Theo অর্থ God বা ঈশ্বর এবং Logy অর্থ অধ্যয়ন বা গবেষণা। তাই Theology অর্থ ঈশ্বর বা খোদা সম্পর্কে গবেষণা বা জানার প্রচেষ্টা। সূরা ইখলাসের ৪টি আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর যে পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে তা মুসলমানদের নিকট সর্বনিয়ন্তা মহাপ্রভু আল্লাহ সম্পর্কে অধ্যয়ন গবেষণার কষ্টিপাথর হিসাবে কাজ করে। কোন সত্তার উপর খোদায়িত্ব আরোপ করা বা কাউকে ঈশ্বর হিসেবে দাবী করা হলে, তাকে অবশ্যই এই কষ্টিপাথর পরীক্ষা বা অগ্নি পরীক্ষায় আসতে হবে। যেহেতু সূরা ইখলাসে বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলীসমূহ অতুলনীয়, তাই এই আয়াতসমূহ কষ্টিপাথররূপে ব্যবহার করে মিথ্যা ও ভুয়া খোদায়ীত্ব দাবীদারকে সহজেই নাকচ করে দেয়া যায়।

"সাধু-সন্ত'দের" ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

ভারতকে প্রায়ই সাধু-সন্তদের দেশ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এর কারণ এখানে তথাকথিত আধ্যাত্মিক ধর্মগুরুদের সংখ্যার প্রাচুর্য। এইসব 'সাধু-সন্ত ও 'বাবা' দের বিপুল সংখ্যক অনুসারী রয়েছে দেশে এবং বিদেশে। কিন্তু ইসলাম কোন মানবীয় সত্তার উপর দেবত্ব আরোপ করাকে কঠোরভাবে পরিহার করে। দেবতা হওয়ার মিথ্যা দাবীদার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য এখন আমরা একজন তথাকথিত সাধু বাবার বিষয় পর্যালোচনা করে দেখতে পারি।

ভারত ভূমিতে জন্ম লাভকারী অসংখ্য তথাকথিত "আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু" দের মধ্যে একজন ছিলেন 'ওশো রজনীশ'। তিনি ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন এবং সেখানে একটি শহর গড়ে তোলেন ও তার নাম দেন 'রজনীশ পুরম'। পরবর্তীতে তিনি পশ্চিমীদের বিরাগভাজন হন এবং অবশেষে তাঁকে সেখানে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং পুনায় নিজস্ব একটি সংঘ (Commune) বা এলাকা গড়ে তোলেন, যা বর্তমানে ওশো সংঘ (Osho Commune) নামে পরিচিত হয়েছে। তিনি ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। 'ওশো রজনীশ'-এর অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। পুনায় 'ওশো কমিউনে' গেলে যে কোন পরিদর্শক ওশো রজনীশের সমাধি স্তম্ভের গায়ে নিম্নরূপ সমাধি লিপি উৎকীর্ণ দেখতে পাবেন ঃ "ওশো– কখনো জন্মগ্রহণ করেননি, কখনো মৃত্যুবরণ করেননি ঃ কেবল এই পৃথিবী গ্রহ ভ্রমণ করেছেন ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩১ হতে ১৯ জানুয়ারী ১৯৯০ পর্যন্ত।"

কিন্তু তাঁর অনুসারীরা এ কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছে যে, পৃথিবীর ২১ টি দেশ তাঁকে ভিসা প্রদান করতে অস্বীকার করে। ভগবান রজনীশ যে পৃথিবী ভ্রমণে এলেন এবং পৃথিবীর কোন দেশে প্রবেশের জন্য তাঁর সে দেশের ভিসার প্রয়োজন হলো এবং ভিসা না পেয়ে অনেক দেশে প্রবেশ করতে পারলেন না, এতে তাঁর অনুসারীরা কোন সমস্যা দেখতে পান না। কোন ব্যক্তি কি 'ঈশ্বর' সম্পর্কে এ কথা কল্পনা করতে পারে যে, ঈশ্বর পৃথিবী ভ্রমণে আসবেন এবং পৃথিবীর কোন দেশে প্রবেশের জন্য তাঁর সে দেশের অনুমতি, ভিসা গ্রহণের প্রয়োজন হবে! গ্রীসের আর্চবিশপ ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি রজনীশকে নির্বাসন না দেয়া হয়, তবে তাঁরা (বিশপের লোকেরা) রজনীশের বাড়ি এবং শিষ্যদেরসহ তাঁকে পুড়িয়ে মারবেন।

ঈশ্বর বা দেবত্বের এই দাবীদার ভগবান রজনীশকে ধর্ম পরীক্ষার মানদণ্ড সূরা ইখলাসের কষ্টিপাথরে এবার যাচাই করে দেখা যাক ঃ

(১) প্রথম মানদণ্ড, "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক এবং অদ্বিতীয়"।

রজনীশ কি এক এবং অদ্বিতীয়? পৃথিবীতে রজনীশের মত অনেক লোক দেবত্বের দাবী করেছে। অবশ্য রজনীশের কোন শিষ্য দাবি করতেও পারে যে রজনীশ একজনই।

(২) দ্বিতীয় মানদণ্ড হচ্ছে, "আল্লাহ পরম, অমুখাপেক্ষী এবং অনাদি-অনন্ত"।

রজনীশ কি পরম এবং অনাদি অনন্ত? রজনীশ নিশ্চয়ই পরম এবং অনাদি বা অনন্ত ছিলেন না, কারণ তিনি ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তাঁর জীবনী থেকে জানতে পারি যে, তিনি ডায়াবেটিক, এজমা এবং ক্রনিক পৃষ্ঠ ব্যথায় ভুগছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার কারাগারে তাঁকে বিষপ্রয়োগ করেছিলেন। ভেবে দেখুন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বিষ প্রয়োগ করা যায়। রজনীশ পরম সত্তাও নয়, অনন্তও নয়।

(৩) তৃতীয় মানদণ্ড হচ্ছে, "তিনি কাকেও জন্ম দেন নাই, কারো জাতও নন"।

আমরা জানি, রজনীশ ভারতের জাবাল পুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মাতা ছিল এবং পিতা ছিল, যারা পরবর্তী সময়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

(৪) চতুর্থ মানদণ্ড যা সবচেয়ে কঠোর তা হচ্ছে, "তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নাই।"

যে মুহূর্তে আপনি "ঈশ্বরের" কথা কল্পনা করেন কিংবা 'ঈশ্বরের' সাথে অন্য কারো তুলনা করতে যান, সেই মুহূর্তে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে সেই অন্য ব্যক্তি যাকে (ঈশ্বরের সাথে তুলনা করা হয়) প্রকৃত ঈশ্বর নয়।

মানসপটে প্রকৃত ঈশ্বরের কোন কল্পচিত্র অঙ্কন করা সম্ভব নয়। আমরা জানি যে রজনীশ একজন মানুষ ছিলেন এবং তাঁর মুখে প্রলম্বিত শশ্রু (দাঁড়ি) ছিল। তার ছিল ২টি চোখ, ২টি কান, ১টি নাক এবং ১টি মুখ। তার আলোকচিত্র এবং বড় আকারের মুদ্রিত ছবি প্রচুর পাওয়া যায়। কাজেই যখনই আপনি ঈশ্বরের কল্পনা করবেন, তখনই এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে রজনীশ প্রকৃত ঈশ্বর নয়।

আমরা ঈশ্বরকে কোন নামে ডাকবো?

মুসলমানরা তাঁকে আল্লাহ নামে ডাকেন এবং ইংরেজী God শব্দের চেয়ে আল্লাহ নামকেই উত্তম মনে করেন। 'আল্লাহ' নাম পবিত্র, অবিমিশ্র, অদ্বিতীয় এবং অনুপম; অন্যদিকে ইংরেজী God শব্দ হতে বিভিন্ন অর্থের বিভিন্ন শব্দ তৈরি করা যায়।

যদি আপনি God শব্দের পরে 'S' যোগ করেন, তবে তা হয়ে যায় Gods, যা God শব্দের বহুবচন। কিন্তু আল্লাহ একটি একক শব্দ, আল্লাহ শব্দের কোন বহুবচন হয় না। God শব্দের শেষে 'dess' যোগ করলে তা একটি স্ত্রীবাচক শব্দ Goddess হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ শব্দের কোন পুরুষ বাচক বা স্ত্রীবাচক রূপ নেই। আল্লাহ জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয়ের ঊর্ধ্বে। যদি আপনি God শব্দের আগে tin শব্দ যোগ করেন, তবে তা হয়ে যায় Tin-God অর্থাৎ ভুয়া ঈশ্বর। কিন্তু আল্লাহ একটি অনুপম নাম যার কোন কল্পচিত্র মানসপটে কখনো কল্পনা করা সম্ভব নয়। কিংবা এই নামের কোন পরিবর্তিত রূপও তৈরি করা যায় না। এজন্য মুসলমানরা আল্লাহকে 'আল্লাহ' নামেই ডাকেন এবং আল্লাহ নামই উত্তম মনে করেন। তবে যখন আমরা অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তব্য প্রদান করি, তখন কখনো কখনো আমাদেরকে আল্লাহকে বুঝানোর জন্য God শব্দ সঠিক না হলেও ব্যবহার করতে হয়। যেহেতু এই বইটি সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মুসলিম অমুসলিম উভয়ের জন্যই লেখা হয়েছে, কাজেই আমি নিবন্ধের অনেক জায়গায় আল্লাহর শব্দের স্থলে God শব্দ ব্যবহার করেছি। (বাংলা অনুবাদে অধিকাংশ স্থানে God শব্দের স্থানে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে- অনুবাদক)।

ঈশ্বর মানুষের রূপ ধারণ করে না

কিছু ব্যক্তি যুক্তি দেখান যে, ঈশ্বর সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে তিনি কেন মানুষের রূপ ধারণ করতে পারবেন না? ঈশ্বর ইচ্ছা করলে মানুষের রূপ ধারণ করতে অবশ্যই পারবেন, কিন্তু ঈশ্বর তখন আর ঈশ্বর থাকবেন না, কারণ ঈশ্বরের এবং মানুষের বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ আলাদা। ঈশ্বরের মানুষ

হওয়ার ধারণা কতখানি উদ্ভট ও অযৌক্তিক নিম্নের অনুচ্ছেদসমূহে আমরা তা দেখতে পাব।

খোদা বা ঈশ্বর অমর এবং মানুষ মরণশীল। আপনি একজন মানুষরূপী ঈশ্বর কোনমতেই পেতে পারেন না, যে একটি অমর সত্তা, কিন্তু একই সাথে এবং একই অস্তিত্বে মরণশীল। এরূপ ধারণা করা অর্থহীন। ঈশ্বর অনাদি, তাঁর কোন আরম্ভ কাল নেই। অন্যদিকে মানুষের আরম্ভকাল রয়েছে। আপনি এরূপ কোন ব্যক্তি বা সত্তার কথা ভাবতে পারেন না যার আরম্ভ নেই এবং একই সাথে আরম্ভ আছে। মানুষের একটি সমাপ্তি আছে। আপনি এরূপ কোন সত্তা পেতে পারেন না, যার সমাপ্তি নেই এবং একই সাথে সমাপ্ত আছে। এরূপ ধারণা অর্থহীন।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের খাবারের কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাবার ও পুষ্টি প্রয়োজন।

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ.

"এবং তিনি সকলকে আহার প্রদান করেন আর তাঁকে কেউ আহার প্রদান করে না।"

[আল কুরআন-৬ ঃ ১৪]

আল্লাহর বিশ্রাম বা ঘুমের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মানুষ ঘুম বা বিশ্রাম ছাড়া থাকতে পারে না।

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই; তিনি চিরঞ্জীব, সর্ববিধাতা। তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর অধীন।"

[আল কুরআন-২ ঃ ২৫৫]

এক মানুষ কর্তৃক অপর মানুষের উপাসনা অর্থহীন

ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের রূপ গ্রহণের ধারণা যদি অগ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে একথাও আমরা অবশ্যই স্বীকার করব যে, এক মানুষ কর্তৃক অপর মানুষের উপাসনা করাও অর্থহীন। ঈশ্বর যদি মানুষের রূপ গ্রহণ করেন, তাহলে তখন তিনি আর ঈশ্বর থাকেন না এবং মানুষের সকল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ, যদি

একজন অত্যন্ত পণ্ডিত অধ্যাপক দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং তাঁর স্মৃতিশক্তির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে তাঁর ছাত্রদের পক্ষে তাঁর কাছ থেকে পাঠ বা শিক্ষা গ্রহণ করা বোকামি হবে।

এছাড়া, ঈশ্বর যদি মনুষ্যরূপ ধারণ করে, তবে সেই মানুষ পরে আর ঈশ্বর হতে পারে না। কারণ মানুষ তার বৈশিষ্ট্যের কারণেই ঈশ্বরে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা ধারণ করে না। অতএব, মানুষের রূপধারী কাউকে ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করা যুক্তিগতভাবেই একটি ভ্রান্তি। কাজেই ঈশ্বরের মনুষ্যরূপ ধারণের যে কোন ধারণাই ভ্রান্ত এবং তা অবশ্যই ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য।

এ কারণেই পবিত্র কুরআন ঈশ্বরের মানবরূপ ধারণ ও মানবসুলভ গুণসম্পন্ন বলে যে কোন ধারণা বা কল্পনার বিরোধী। মহিমান্বিত কুরআন নিম্নের আয়াতে কী বলে দেখুন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নাই।" [আল কুরআন-৪২ ঃ ১১]

খোদা তা'আলা অখোদাসুলভ কোন কাজ করেন না

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহিমান্বিত সত্তা বিরোধী কোন কাজ করেন না

মহান আল্লাহ সকল ইনসাফ ও সুবিচার, দয়া এবং সত্যের মূল উৎস। তাই তাঁর গুণাবলী যে কোন মন্দতা থেকে মুক্ত। আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা চিন্তাও করা যায় না যে তাঁর সত্তার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন কাজ তিনি করেন। কাজেই এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে তিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন, কিংবা অবিচারমূলক কাজ করতে পারেন, কিংবা কোন ভুল করতে পারেন, অথবা কিছু ভুলে যেতে পারেন অথবা এইরূপ মানবীয় দুর্বলতার কোন কাজ করতে পারেন। আল্লাহ সুবিচার পরিপন্থী কাজ করার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু তিনি তা কখনো করেন না, কারণ এরূপ করা তাঁর মহান সত্তার বিরোধী। পবিত্র কুরআন বলে ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

"নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলা এক বিন্দু পরিমাণও অবিচার করেন না"।

[আল কুরআন-৪ ঃ ৪০]

আল্লাহ্ চাইলে অবিচারমূলক কাজ করতে পারবেন, কিন্তু তিনি কখনো তা করেন না। তিনি চিরদিন সুবিচারক।

আল্লাহ্ কখনো ভুলে যান না এবং তিনি কোন ভুল করেন না

আল্লাহ্ কখনো কোন কিছু ভুলে যান না, কারণ এটি আল্লাহ্র সত্তার বৈশিষ্ট্য বিরোধী। ভুলে যাওয়া মানবীয় দুর্বলতা ও মানবীয় সীমাবদ্ধতা। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ কোন ভুল করেন না। কারণ ভুল করাটা আল্লাহ্র সত্তার বিরোধী।

পবিত্র কুরআন বলে ঃ

لاَ يَضِلُّ رَبِّىْ وَلاَ يَنْسَى -

"আমার প্রভু কখনো বিভ্রান্ত হন না এবং কখনো ভুলেও যান না"

[আল কুরআন-২০ ঃ ৫২]

ঈশ্বর কেবল ঈশ্বরসুলভ কাজ করেন

ঈশ্বর সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। ইসলামী মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর তথা আল্লাহ বিশ্ব নিখিলের সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআন বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"নিশ্চয়, আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"

[আল কুরআন-২ ঃ ১০৬]

[আল কুরআন-২ ঃ ১০৯]

[আল কুরআন-২ ঃ ২৮৪]

[আল কুরআন-৩ ঃ ২৯]

[আল কুরআন-১৬ ঃ ৭৭]

[আল কুরআন-৩৫ ঃ ১]

মহিমান্বিত কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ.

"তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই সম্পন্ন করেন।"

[আল কুরআন-৮৫ ঃ ১৬]

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ কেবল তাঁর আল্লাহ সত্তার সাথে সংগতিপূর্ণ কাজেরই ইচ্ছা করেন, এর বিপরীত কোন কাজের ইচ্ছা করেন না।

অনেক ধর্ম কোন কোন ক্ষেত্রে এসে, কখনো সরাসরিভাবে আবার কখনো পরোক্ষভাবে, ঈশ্বরের মানব রূপে পৃথিবীতে আগমনের দর্শনে বিশ্বাস করে থাকে। তাদের যুক্তি এই যে, মহান ঈশ্বর এত পবিত্র এবং নিষ্কলুষ যে তিনি পৃথিবীতে মানুষের দু:খ-কষ্ট, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে অবহিত নন। কাজেই তিনি মানুষের দু:খ-কষ্ট লাঘব ও মুক্তির জন্য এবং মানুষের পথ নির্দেশনা প্রদানের জন্য মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে আগমন করেন। এই প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। আসুন আমরা এ যুক্তিকে বিশ্লেষণ করি এবং দেখি যুক্তির বিচারে এ ধারণা টিকে কি না।

স্রষ্টা তাঁর নির্দেশনা বিধান তৈরি করে দিয়েছেন

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়াতা'আলা) বুদ্ধিমত্তা ও বিচারশক্তি সহকারে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি তৈরি বা আবিষ্কার করি। উদাহরণ স্বরূপ, এখন আমাদের প্রয়োজনে বিপুল সংখ্যায় টেপ রেকর্ডার তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু এ কথা কেউ কখনো বলে না যে একটি টেপ রেকর্ডারের জন্য কী ভাল হবে তা বুঝতে তার নির্মাতাকে নিজেকেই টেপ রেকর্ডার হতে হবে। এ কথা যে কেউ সহজেই বুঝেন যে নির্মাণকারী এই যন্ত্র ব্যবহারে সহায়তা করার জন্য শুধুমাত্র একখানি ব্যবহার-নির্দেশিকা প্রকাশ করেন, যেহেতু তাঁর নির্মিত যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। অন্য কথায়, এই ব্যবহার-নির্দেশিকাই বলে দেয়, এই যন্ত্রটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী করতে হবে এবং কী করতে হবে না।

আপনি যদি মানুষকে একটি যন্ত্র হিসাবে চিন্তা করেন, তবে নি:সন্দেহে মানুষ আল্লাহ তা'আলার একটি জটিল সৃষ্টি। কিন্তু তাই বলে মানুষের জন্য কী ভাল আর কী মন্দ তা জানার জন্য বিশ্ব প্রভু ও স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলাকে মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসার প্রয়োজন হয়নি। তিনি মানব জাতির জন্য কেবলমাত্র ব্যবহার-নির্দেশিকা বা চলার পথের বিধান নাজিল করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনই হচ্ছে মানব জাতির জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত চলার পথের বিধান।

উপরন্তু, যেহেতু রোজ হাশরের মহা বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট এই মানুষের পৃথিবীর কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন, সুতরাং এটি খুবই যুক্তিসঙ্গত যে

এ জীবনে আমাদের কী করণীয় এবং কী করণীয় নয়, সে সম্পর্কে মহান স্রষ্টা আমাদেরকে অবহিত করেছেন।

আল্লাহ তাঁর মনোনীত রাসূল বা সংবাদ বাহক প্রেরণ করেন

মানুষের ব্যবহার-নির্দেশিকা বা জীবন বিধান নিজে লিখে দেয়ার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পৃথিবীতে আগমনের প্রয়োজন হয় না। যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বার্তা পৌছে দেয়ার জন্য প্রত্যেক জাতির নিকট তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর প্রেরিত এই মনোনীত ব্যক্তিদের বলা হয় আল্লাহর রাসূল ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

কিছু লোক 'অন্ধ' এবং 'বধির'

ঈশ্বর কর্তৃক মনুষ্য আকৃতি ধারণ করার দর্শন অযৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও অনেক ধর্মের অনুসারীরা এটি বিশ্বাস করে এবং অন্যদের নিকট প্রচারও করে। এটা কি মানুষের বুদ্ধি-বিচেনার প্রতি এবং যে স্রষ্টা মানুষকে বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর প্রতি অপমানজনক বিশ্বাস নয়?

এই লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে 'বধির' এবং অন্ধ, যদিও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শ্রবণ শক্তি এবং দর্শন শক্তি দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ.

"তারা বধির, বোবা এবং অন্ধ, কাজেই তারা আর ফিরবে না।"

[আল কুরআন-২ ঃ ১৮]

বাইবেলের মথি লিখিত সুসমাচারে একই রকম কথা বলা হয়েছে ঃ

"দেখেও তারা দেখে না; শুনেও তারা শুনে না, তারা বুঝতেও পারে না।"

[বাইবেল ম্যাথিউ-১৩ ঃ ১৩]

হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ঋগবেদেও একই রকম কথা বলা হয়েছে ঃ

"কিছু মানুষ এমন আছে, যারা শব্দসমূহ দেখে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দেখে না; কিছু মানুষ এমনও আছে যারা এই সকল কথা শুনতে পায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সেগুলো শুনে না।"

[ঋগবেদ-১০ ঃ ৭১ ঃ ৪]

আল্লাহর গুণাবলী

সুন্দরতম নামসমূহের মালিক আল্লাহ।

পবিত্র কুরআন বলছে,

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى.

"আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ নামেই ডাকো কিংবা রহমান নামেই ডাকো; যে নামেই ডাকবে (তাই উত্তম)। কারণ তাঁর রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ।"

[আল কুরআন-১৭ ঃ ১১০]

আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ সম্পর্কে একই রকম বাণী পুনরুল্লেখিত হয়েছে কুরআনের আরো কয়েকটি আয়াতে, যেমন ঃ

সূরা আল আরাফ (৭ ঃ ১৮০), সূরা ত্বাহা (২০ ঃ ৮) এবং সূরা আল হাশর (৫৯ ঃ ২৩-২৪)।

পবিত্র কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার অন্ততপক্ষে ৯৯টি গুণবাচক নাম উল্লেখিত হয়েছে এবং সবগুলোর চূড়ান্ত বা পূর্ণতাজ্ঞাপক নাম আল্লাহ।

কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহর অনেক নামের মধ্যে রয়েছে আর রহমান (পরম করুণাময়), আর রাহীম (পরম দয়াবান) আল হাকীম (পরম প্রজ্ঞাময়) ইত্যাদি। আপনি আল্লাহকে যে কোন নামে ডাকতে পারেন, তবে সে নাম হতে হবে সুন্দর এবং তা অবশ্যই মানসপটে কোন ছবি সৃষ্টি করবে না।

আল্লাহর প্রতিটি গুণই অনন্য এবং কেবলমাত্র তাঁরই

আল্লাহর সকল গুণাবলী একক ও অনন্য এবং সে গুণাবলী কেবলমাত্র তাঁরই একার। একই সাথে তাঁর প্রতিটি গুণই তাঁর পরিচিতি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট। আমি এই বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে চাই। তুলনা দিয়ে বুঝার জন্য আমরা একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। যেমন ধরা যাক, নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং।

যদি কেউ বলেন যে নীল আর্মস্ট্রং একজন আমেরিকান, তবে নীল আর্মস্ট্রং-এর আমেরিকান হওয়ার এ গুণ সঠিক, কিন্তু শুধু একজন আমেরিকান এই গুণ তাঁর পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ নীল আর্মস্ট্রং ছাড়াও অসংখ্য আমেরিকান আছেন।

অনুরূপভাবে, যদি বলা হয়, নীল আর্মস্ট্রং একজন নভোচারী; তবে এই নভোচারী গুণ আর্মস্ট্রং-এর এ কথা ঠিক, কিন্তু শুধু এই নভোচারী নাম দিয়ে আর্মস্ট্রং এর পরিচয় স্পষ্ট হবে না। কারণ নভোচারী গুণ তাঁর একার নয়, আর্মস্ট্রং ছাড়াও আরো অনেক নভোচারী আছে।

কোন ব্যক্তিকে এককভাবে সুচিহ্নিত করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর একটি অনন্য নাম বা গুণ খুঁজে পেতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, নীল আর্মস্ট্রং চন্দ্র পৃষ্ঠে পদার্পণকারী প্রথম মানুষ। সুতরাং যদি কেউ প্রশ্ন করে চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণকারী প্রথম মানুষ কে? তাহলে এর একটি মাত্র উত্তর হবে, নীল আর্মস্ট্রং। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তা'আলার গুণ হবে অনন্য। যেমন, বিশ্ব নিখিলের স্রষ্টা। যদি আমি বলি, একটি ভবনের স্রষ্টা, তবে এটি সম্ভব ও সত্য হতে পারে, কিন্তু এটি একক ও অনন্য নয়। কারণ হাজার হাজার মানুষও একটি ভবনের নির্মাণকারী হতে পারে। সেক্ষেত্রে তখন মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু আল্লাহর প্রত্যেকটি গুণ কেবলমাত্র আল্লাহর সাথেই সংশ্লিষ্ট, অন্য কারো সাথে নয়।

উদাহরণ স্বরূপ

"আর রাহীম" - পরম দয়াবান

"আর রহমান" - পরম করুণাময়

"আল হাকীম" - পরম প্রজ্ঞাময়

যদি কেউ প্রশ্ন করে, "আর রাহীম" বা পরম দয়াবান কে, তবে তার উত্তর হতে পারে একটিই, তাহলো মহান আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহর একটি গুণ অন্যান্য গুণাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক হবে না

আমরা পূর্বের উদাহরণ পুনরায় উল্লেখ করতে পারি। যদি কোন ব্যক্তি বলে নীল আর্মস্ট্রং একজন আমেরিকান নভোচারী,, যার উচ্চতা মাত্র চার ফুট; এখানে তাঁর 'আমেরিকান নভোচারী' এই গুণটি সঠিক, কিন্তু তার আনুসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ চার ফুট উচ্চতা) এটি মিথ্যা। অনুরূপভাবে, যদি কেউ বলে যে আল্লাহ মহাবিশ্বের স্রষ্টা যার একটি মাথা, দুটি হাত, দুটি পা ইত্যাদি আছে, তবে 'মহাবিশ্বের স্রষ্টা' এই গুণটি সত্য কিন্তু আনুসংগিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মাথা, হাত, পা ইত্যাদি ভুল এবং মিথ্যা।

সকল গুণাবলী কেবল এক আল্লাহর প্রতি এবং সে একজনের প্রতিই নির্দেশিত হবে

যেহেতু আল্লাহ একজনই মাত্র আছেন, সুতরাং সকল গুণাবলী শুধু সেই এক আল্লাহর প্রতিই নির্দেশিত হবে। যদি বলা হয় যে মহাবিশ্বের স্রষ্টা এক আল্লাহ এবং প্রতিপালক আরেকজন, তবে তা হবে সম্পূর্ণ এক অযৌক্তিক কথা, কারণ আল্লাহ মাত্র একজনই এবং তাঁর সকল গুণাবলীর সমাহার তাঁর সত্তার মাঝেই নিহিত।

আল্লাহর এককত্ব

কোন কোন বহুঈশ্বরবাদী বলেন যে, একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক নয়। তাদেরকে আমরা একথা বলতে চাই যে, যদি একজনের বেশি ঈশ্বর থাকতো তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতো এবং প্রত্যেকেই অন্যদের ইচ্ছার বিপরীতে নিজের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করতে চাইতো। এরূপ বিরোধ-বিসম্বাদ বহু-ঈশ্বরবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী ধর্মসমূহের বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীতে দেখা যায়। একজন 'ঈশ্বর' যদি পরাজিত হয় কিংবা অন্যদেরকে পরাজিত করতে অসমর্থ হয়, তবে সে অবশ্যই প্রকৃত এক ঈশ্বর নয়। বহু ঈশ্বরবাদী ধর্মসমূহে আরেকটি বিশ্বাস ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে অনেক ঈশ্বরের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক কাজের দায়িত্ব আছে। প্রত্যেকে মানব জগতের একেকটি বিশেষ দিক বা অংশের জন্য দায়ী। যেমন সূর্য দেবতা, বৃষ্টি দেবতা ইত্যাদি। এরূপ হলে প্রমাণিত হয় যে একজন ঈশ্বর বা দেবতা কোন একটি ক্ষেত্রে কাজের ক্ষমতা রাখলেও অন্যান্য কাজের ক্ষমতা রাখে না এবং তাছাড়াও সে অন্যান্য ঈশ্বরদের কর্তব্য এবং দায়িত্বাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ। কিন্তু অজ্ঞ এবং অক্ষম কেউ ঈশ্বর হতে পারে না। অন্য কথায় প্রকৃত ঈশ্বর অজ্ঞ এবং অক্ষম হতে পারেন না। যদি একজনের অধিক ঈশ্বর থাকতো, তবে মহাবিশ্বে নৈরাজ্য, বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংস দেখা দিতো। কিন্তু মহাবিশ্ব পূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে পরিচালিত।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

"যদি আকাশ ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য থাকত, তবে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই বিশৃঙ্খল হয়ে যেত। সুতরাং আল্লাহ, যিনি আরশের অধিপতি, ঐ সকল বিষয় হতে পবিত্র যা তারা বলে থাকে।"

[আল কুরআন-২১ ঃ ২২]

যদি এক আল্লাহ ছাড়া আরো কোন ঈশ্বর থাকত, তবে তারা নিজদের সৃষ্টি আলাদা করে নিয়ে যেত।

পবিত্র কুরআন বলে ঃ

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

"আল্লাহ কাকেও সন্তান গ্রহণ করেননি, আর না তাঁর সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে; যদি তেমন থাকত, তবে প্রত্যেক মা'বুদ নিজের সৃষ্টিকে পৃথক করে নিত এবং একে অন্যের উপর চড়াও হত; অথচ আল্লাহ সেসব কথা হতে পবিত্র- যা তারা তাঁর সম্বন্ধে বলে থাকে।"

[আল কুরআন-২৩ ঃ ৯১]

সুতরাং একজন মাত্র পরম সত্য, সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বই আল্লাহ বা ঈশ্বর সম্পর্কিত একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ধারণা।

কয়েকটি ধর্ম আছে যেগুলো অজ্ঞাবাদমূলক অর্থাৎ বস্তুগত জগতের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে যাদের কোন বক্তব্য নাই। যেমন- বৌদ্ধ ধর্ম এবং কনফুসীয় মতবাদ। ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের কোন মন্তব্য নেই। তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারও করে না, এর বিরোধিতাও করে না।

কিছু ধর্ম আছে যেমন, জৈন ধর্ম– তারা নিরিশ্বরবাদী ধর্ম; তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

(ইনশায়াল্লাহ, আমি আগামীতে "কুরআন কি আল্লাহর বাণী?" শিরোনামে একটি বই প্রকাশের আশা রাখি, যে বই, আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কুরআনের ভিত্তিতে যুক্তি, তর্ক ও বিজ্ঞান সহযোগে নিরীশ্বরবাদী কিংবা অজ্ঞাবাদীদের নিকট আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।)

সকল ধর্ম চূড়ান্ত বিচারে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে

ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী প্রধান ধর্মসমূহ চূড়ান্ত বিচারে, উচ্চতর স্তরে গিয়ে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা আল্লাহতে বিশ্বাস করে। সকল ধর্মগ্রন্থই প্রকৃতপক্ষে একেশ্বরবাদের পক্ষে অর্থাৎ একজন মাত্র প্রকৃত ঈশ্বরে তথা এক আল্লাহতে বিশ্বাসের কথা বলে।

মানুষ নিজেদের স্বার্থে ধর্মগ্রন্থে পরিবর্তন এনেছে

সময়ের পথ পরিক্রমায় অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থেই বিকৃতি এবং পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে মানুষের নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে। এই প্রক্রিয়ায় অনেক ধর্মের মুল বিশ্বাসকে একেশ্বরবাদ থেকে সর্বেশ্বরবাদে অথবা বহু-ঈশ্বরবাদে বিকৃত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন বলে,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ.

"অতএব, বড়ই দুর্ভাগ্য তাদের জন্য, যারা নিজেদের হাতে কিতাব লিখে, অত:পর বলে, ইহা আল্লাহর পক্ষ হতে; তাদের উদ্দেশ্য এর দ্বারা সামান্য কিছু উপার্জন করবে; সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে সর্বনাশ, তারা নিজেদের হাতে যা লিখেছে তা হতে, তাদের আরো আছে সর্বনাশ, তারা যা কিছু উপার্জন করে তা হতে।"

[আল কুরআন-২ ঃ ৭৯]

তাওহীদ

তাৎপর্য এবং প্রকার

ইসলাম তাওহীদে বিশ্বাসী। তাওহীদ অর্থ শুধু আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস নয় বরং আরো বেশি কিছু। শাব্দিক অর্থে তাওহীদ অর্থ 'একত্রীকরণ' অর্থাৎ 'একত্ব ঘোষণাকরণ। তাওহীদ শব্দটি আরবী 'ওয়াহহাদা' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ এক করা বা হওয়া, একীভূত করা। তাওহীদকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) তাওহীদ আর-রুবুবিয়াত।

(খ) তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত

(গ) তাওহীদ আল-ইবাদাত।

(ক) তাওহীদ আর-রুবুবিয়াত (আল্লাহর প্রভুত্বের একত্ব মেনে চলা)

তাওহীদের প্রথম প্রকার হচ্ছে তাওহীদ আর-রুবুবিয়াত। রুবুবিয়াত শব্দটির মূল ক্রিয়া শব্দ হচ্ছে 'রব্ব', যার অর্থ প্রভু, লালনকারী, প্রতিপালনকারী। সুতরাং তাওহীদ আর-রুবুবিয়াত অর্থ হচ্ছে প্রভুত্বের বা প্রতিপালকত্বের একত্ব। এই প্রকার তাওহীদের ভিত্তি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ সকল অস্তিত্ববান জিনিসকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন এই মৌলিক বিশ্বাস। সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে, সকল কিছু তিনি শূন্য অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি একাই এককভাবে সমগ্র মহাবিশ্ব এবং তার মধ্যে যত কিছু আছে, সব কিছুরই স্রষ্টা এবং প্রতিপালনকারী। এ জন্য তাঁর কোন কিছুরই প্রয়োজন হয়নি।

(খ) তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত (আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁর একত্ব মেনে চলা)

তাওহীদের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে 'তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত। অর্থাৎ আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর একত্ব অনুসরণ করা। এই তাওহীদ বিশ্বাসের পাঁচটি দিক আছে ঃ

(১) আল্লাহ সম্পর্কে ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করা উচিত যেভাবে আল্লাহ নিজে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর নবীও বর্ণনা করেছেন। যেভাবে বা যে রীতিতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঠিক সেভাবেই আল্লাহ

সম্পর্কে বর্ণনা করতে হবে। তাঁর নাম ও গুণাবলীকে তাদের সুস্পষ্ট অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

(২) আল্লাহ নিজেকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন, ঠিক সেভাবেই তাঁকে উল্লেখ করতে হবে। তাঁর নিজের নাম ছাড়া তাঁকে কোন নতুন নাম বা নতুন গুণাবলী দিয়ে উল্লেখ করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহকে এমন নতুন নাম যেমন 'আল গাদিব' (রাগান্বিত) দেয়া যাবে না, যদিও তিনি বলেছেন যে তাঁর রাগ আছে, কারণ আল্লাহ নিজে কিংবা তাঁর রাসুল (সা) এই নাম ব্যবহার করেননি।

(৩) আল্লাহর উপর তাঁর সৃষ্টির কোন গুণ আরোপ করা যাবে না। আল্লাহ সম্পর্কে উল্লেখ করার সময় তাঁর সৃষ্ট কোন কিছুর গুণ তাঁর উপর আরোপ করা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, বাইবেলে আল্লাহকে তাঁর ভুল চিন্তার জন্য অনুশোচনাকারী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, ঠিক যেমন মানুষ তাদের ভুল উপলব্ধি করতে পেরে অনুশোচনা করে। এটি সম্পূর্ণরূপে তাওহীদী নীতির পরিপন্থী। আল্লাহ কখনোই অনুশোচনা করেন না এবং তিনি কখনোই কোন ভুল করেন না।

আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ে আলোচনা বা কথা বলার মূলনীতি পবিত্র কুরআনের সূরা 'আশ শূরায় প্রদত্ত হয়েছে ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নাই এবং তিনি সর্ববিষয় শ্রবণকারী এবং দর্শনকারী।"
আল কুরআন-৪২ ঃ ১১]

যদিও দেখা এবং শুনা মানবীয় বৈশিষ্ট্য, কিন্তু যখন তা আল্লাহর সম্পর্কে বলা হয়, তখন তা সকল তুলনার ঊর্ধ্বে, কারণ মানুষের একাজে প্রয়োজন হয় চোখের এবং কানের এবং তারা দর্শন ও শ্রবণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(৪) আল্লাহর কোন গুণ মানুষের উপর আরোপ করা যাবে না। আল্লাহর কোন গুণসহ কোন মানুষকে বর্ণনা করা তাওহীদ নীতির পরিপন্থী। উদাহরণ স্বরূপ, কোন মানব সম্পর্কে, তার কোন আরম্ভ নেই কিংবা সমাপ্তি নেই (অমর), এরূপ বলা যাবে না।

(৫) আল্লাহর কোন নাম তাঁর সৃষ্টিকে প্রদান করা যাবে না। কোন কোন নাম অনির্দিষ্ট আকারে মানুষের জন্য ব্যবহারের অনুমোদনযোগ্য যেগুলো আল্লাহ তাঁর

নবীদের জন্য ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সুনির্দিষ্ট আকারে যেমন, আর রাউফ এবং 'আর রাহীম, কেবল তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন এগুলোর পূর্বে 'আবদ' শব্দ যোগ করা হবে, যার অর্থ দাস বা বান্দা; যেমন 'আবদুর রউফ' কিংবা 'আবদুর রাহীম'।

(গ) তাওহীদ আল ইবাদাত (ইবাদাতের একত্ব বজায় রাখা)

(১) ইবাদাতের সংজ্ঞা এবং অর্থ ঃ 'তাওহীদ আল ইবাদাত'-এর অর্থ হচ্ছে ইবাদাত বা উপাসনার ক্ষেত্রে একত্ব বজায় রাখা বা অনুসরণ করা। ইবাদাত শব্দটি এসেছে মূল আরবী 'আবদু' শব্দ হতে যার অর্থ হচ্ছে দাস বা বান্দা। কাজেই ইবাদাত হচ্ছে দাসত্ব করা বা উপাসনা করা। সালাত হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি ইবাদাত বা উপাসনা, তবে এটিই একমাত্র ইবাদাতের রূপ নয়। অনেকে ভুল ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত অর্থ কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সালাত আদায় করা, কিন্তু ইসলামে ইবাদাতের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর দাসত্ব মেনে নেয়া। আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ মেনে চলা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করার নামই ইবাদাত এবং এই ইবাদাতের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ নিজে এবং অন্য আর কেহই নয়।

(২) তাওহীদের এই তিনটি ক্ষেত্রের সবগুলোই একই সাথে অনুসরণ করতে হবে। কেবলমাত্র প্রথমোক্ত দুইটি ক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপন করা কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রটি বাস্তবায়ন না করা নিরর্থক। পবিত্র কুরআন মহানবী (সা)-এর যুগের 'মুশরিকীন'দের উদাহরণ পেশ করেছে, যারা তাওহীদের প্রথমোক্ত দুইটি দিকের উপর বিশ্বাসের স্বীকৃতি প্রদান করতো।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ.

"আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমীন থেকে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা তিনি কে, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর

পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন? আর তিনি কে যিনি জীবন্তকে মৃত হতে এবং মৃতকে জীবন্ত হতে বের করেন এবং তিনি কে, যিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে যে তিনি আল্লাহ। অতএব আপনি বলুন, তবে কেন তোমরা (শিরক হতে) সাবধান থাকছ না"

[আল কুরআন-১০ ঃ ৩১]

একই রকম উদাহরণ পুনরায় কুরআনের সূরা যুখরুফে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। এর পরও তারা (সত্য পথ ছেড়ে) উল্টো কোন পথে চলেছে?"

[আল কুরআন-৪৩ ঃ ৮৭]

পৌত্তলিক মক্কাবাসীরা জানতো যে মহান আল্লাহই তাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদানকারী, প্রভু এবং প্রতিপালনকারী। তবু তারা মুসলিম ছিল না কারণ তারা একই সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনা করত। মহান আল্লাহ তাদেরকে 'কুফফার' (অবিশ্বাসী) এবং 'মুশরিকীন' (পুতুল পূজারী এবং আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী) শ্রেণীভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ.

"আর তাদের অধিকাংশ লোক, যারা আল্লাহকে মেনেও থাকে কিন্তু এভাবে যে আল্লাহর সাথে অংশীদারও স্বীকার করে।"

[আল কুরআন-১২ ঃ ১০৬]

সুতরাং 'তাওহীদ আল ইবাদাত' অর্থাৎ ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব মেনে চলা তাওহীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইবাদাত পাওয়ার অধিকারী বা হকদার একমাত্র আল্লাহ এবং একমাত্র তিনি মানুষকে তার ইবাদাতের বিনিময়ে কল্যাণ দান করতে পারেন।

শিরক

(ক) সংজ্ঞা

পূর্ব পৃষ্ঠাসমূহে বর্ণিত তাওহীদের বিভিন্ন দিক বা বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটিকে ছেড়ে দেয়া কিংবা তাওহীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটি পূরণ না করাই শিরক হিসেবে বিবেচিত। শাব্দিক অর্থে শিরক মানে হচ্ছে অংশ প্রদান বা অংশীদার গ্রহণ। ইসলামী পরিভাষায় 'শিরক' অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন এবং এটি পৌত্তলিকতার সমতুল্য।

(খ) শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ যা আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করবেন না

পবিত্র কুরআনের সূরা নিসায় সবচেয়ে বড় পাপ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শরীক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য পাপ, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে, সে গুরুতর পাপে পাপী হল।"

[আল কুরআন-৪ ঃ ৪৮]

একই রকম বাণী সূরা নিসা'র অপর জায়গায় পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً ۢبَعِيْدًا.

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করাকে ক্ষমা করবেন না এবং এ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় পাপ, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে, সেত বহু দূরের পথ ভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে।"

[আল কুরআন-৪ ঃ ১১৬]

(গ) শিরক জাহান্নামের আগুনের দিকে পরিচালিত করে

পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদা-তে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْاۤ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ

الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

"নিশ্চয় তারা কাফির হয়েছে, যারা বলেছে যে, আল্লাহ, তিনিতো মাসীহ্ ইবনে মারইয়াম; অথচ মাসীহ্ নিজেই বলেছেন যে, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করবে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এবং এরূপ যালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না।"

[আল কুরআন-৫ ঃ ৭২]

(ঘ) আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রতি ইবাদাত এবং আনুগত্য নয়

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

"আপনি বলুন, হে আহলি কিতাব! এসো এমন এক কথার দিকে যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে (স্বীকৃত হওয়ার দিক দিয়া) সমান। তাহা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করব না এবং আল্লাহর সাথে কাকেও অংশীদার সাব্যস্ত করব না এবং আমাদের মধ্য হতে কেউ আল্লাহকে পরিত্যাগ করে অন্য কাকেও রব বা প্রভু গ্রহণ করব না। অত:পর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তোমরা বলে দাও ঃ তোমরা সাক্ষী থাক যে আমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্যকারী, মুসলিম।"

[আল কুরআন-৩ ঃ ৬৪]

উপসংহার

পবিত্র কুরআন বলে

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

"এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করে, তাদেকে গালি দিওনা, কেননা তাহলে তারাও মূর্খতাবশত: সীমালঙ্ঘনপূর্বক আল্লাহর শানে বেআদবী করবে।"

[আল কুরআন-৬ ঃ ১০৮]

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلاَمٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"এবং সমগ্র জগতে যত বৃক্ষরাজি রয়েছে, যদি সবই কলম হয়, আর এই যে সমুদ্র রয়েছে, এ ছাড়া আরো সাতটি সমুদ্র (কালি) হয়, তবুও আল্লাহর বাক্যসমূহ (লিখে) শেষ হবে না। নি:সন্দেহে, আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"

[আল কুরআন-৩১ ঃ ২৭]

يٰاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ.

"হে মানবগণ! এক আশ্চর্য কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যে সমস্ত বস্তুর উপাসনা করছ, এরা একটি মক্ষিকাও সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়– যদি এরা সকলেও এই উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় তবুও; আর যদি মক্ষিকা তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তখন তারা উহা হতে সেই বস্তুকে ছাড়িয়ে নিতেও সক্ষম হয় না। এমন উপাসকও অক্ষম এবং এমন উপাস্যও অক্ষম।"

[আল কুরআন-২২ ঃ ৭৩]

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতসমূহের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদানকারী এবং প্রতিপালনকারী।

– সমাপ্ত –

রিসার্চ ফাউন্ডেশন পরিবেশিত গ্রন্থসমূহ

বাংলা

- অলৌকিক কিতাব আল-কুরআন- আহমেদ দিদাত, অনুবাদ : *এ কে মোহাম্মদ আলী*
- ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের প্রশ্নের জবাবে ডা. জাকির নায়েক- অনুবাদ : *এম.জি. কিবরিয়া*
- বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব- মূল : ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : *মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার*
- বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল-কুরআন ও বাইবেল
  মূল : *ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : শফিকুল ইসলাম মাসুদ*
- বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা- *ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : মো: মনিরুল ইসলাম*
- কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান : সংগতিপূর্ণ না সংগতিহীন
  ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : এন.আই. মল্লিক

মুহাম্মাদ আনওয়ার হুসাইন রচিত– ড. এস.এম আজহারুল ইসলাম সম্পাদিত

- **আল কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ–**
  - সিরিজ- (১) কুরআন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগব্যাংগ
  - সিরিজ- (২) কুরআন, কিয়ামাত ও পরকাল
  - সিরিজ- (৩) কুরআন, মহাবিশ্ব ও মূলতত্ত্ব
  - সিরিজ- (৪) কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধ্বংস
  - সিরিজ- (৫) কুরআন, কোয়াসার ও শিংগায় ফুৎকার
- আদমের আদি উৎস- *আল মেহেদী*
- সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য- *আল মেহেদী*
- বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান- *মুহাম্মদ নূরুল আমীন*
- মহাকাশ গাইড- *মুহাম্মাদ আনওয়ার হুসাইন*

ইংরেজী

- Towards Understanding Islam - *S A A Maudoodi*
- Fundamentals of Islam - *S A A Maudoodi*
- Nations rise and fall why - *S A A Maudoodi*
- The Quran & Modern Science : Compatible or incompatible - *Dr. Zakir Naik*
- The Quran & The Bible in the light of Science - *Dr. Zakir Naik*
- Concept of God in Major Religions - *Dr. Zakir Naik*
- Universal Brotherhood - *Dr. Zakir Naik*
- Answers to Non-Muslims Common Questions about Islam - *Dr. Zakir Naik*
- Is non-vegetarian food permitted or prohibited- *Dr. Zakir Naik*
- Is the Quran God's word - *Dr. Zakir Naik*
- Similarities Between Hinduism and Islam - *Dr. Zakir Naik*

THE RESEARCH FOUNDATION FOR QURAN & SCIENCE
দি রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স
২৪৬ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, ফোন ঃ ০১৯১১ ০১২৯৭৬